Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXV, June 2018

নীট্‌শের নান্দনিক অস্তিত্ববাদ

মো. শওকত হোসেন*

সার-সংক্ষেপ: *জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নীট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০ খ্রি:) দর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত ব্যতিক্রম ধরনের একজন দার্শনিক। দর্শনের ঐতিহ্যগত দিক বিবেচনায় তাঁকে কোন বিশেষ দার্শনিক বা বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের বলে এক কথায় গ্রহণ করা অসম্ভব বলেই প্রতিয়মান হয়। তাঁর আবির্ভাব অনেকটা উল্কার মতো। তিনি দর্শনের সুপরিচিত ব্যাকরণ তথা পদ্ধতি মেনে সর্বদা কাজ করেননি। তাঁর তত্ত্বে যেমন অবিনবত্ব বিদ্যমান তেমনি তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপনার ধরনে রয়েছে বহুমুখিতা। সব মিলিয়ে দার্শনিক বিচারমূলক অনুসন্ধানে নীট্‌শেকে নিয়ে একজন গবেষক এমনকি সাধারণ পাঠক বিব্রত বোধ করতে পারেন। তাঁকে কোন অভিধায় আখ্যায়িত করা যায় তা নিয়ে নিয়ে দর্শনে রয়েছে নানারকম অভিমত। তবে একথা সত্য যে, তাঁর বক্তব্যের মধ্য থেকে নানা রকম বিরোধপূর্ণ মতের সন্ধান প্রাপ্তির সুযোগটি তিনিই করে দিয়েছেন। তার পরও নীট্‌শের দর্শনকে কিছুটা হলেও কোন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নামে তুলে ধরা যায় কিনা এ প্রবন্ধের এটাই প্রথম প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মতবাদকে সামগ্রিকভাবে নান্দনিক অস্তিত্ববাদ (aesthetic existentialism) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার জানা মতে, তাঁকে এভাবে মূল্যায়ন করা একটি অভিনব কাজ। যদিও তাঁকে অস্তিত্ববাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং ফেলা হয়ে থাকে নাস্তিক অস্তিত্ববাদের দলে; এ গবেষণায় এ ধরনের শ্রেণিকরণকে অ-প্রাসঙ্গিক, এমনকি, অনেকটা অমূলক বলেও দেখানো হয়েছে। এবং তারপর নান্দনিক অস্তিত্ববাদ বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে নীট্‌শেকে কেন এই মতবাদের একজন প্রবক্তা বলা যায় তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, নীট্‌শের এ বিশেষ ধরনের মতাদর্শ প্রদানের প্রেক্ষাপট এবং পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।*

শুরুতেই একথা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, নীট্‌শেকে কেন নানাভাবে দেখা হয়ে থাকে বা দেখার সুযোগ আছে কিনা। নীট্‌শেকে বিভিন্নভাবে আলোচনার বিষয়টি

* **ড. মো. শওকত হোসেন:** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

এটা প্রমাণ করে না যে, অন্য কোন দার্শনিককে বিভিন্নভাবে দেখা যায় না। দর্শনের ক্ষেত্রটিই এমন যে, যে কোন মতবাদকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তবে দর্শনের ইতিহাসে যারা গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিচিত তাঁদের প্রায় সকলেরই সুনির্দিষ্ট কিছু মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং তা প্রকাশের জন্য তাঁরা কোন বিশেষ পদ্ধতি'র আশ্রয়ই নিয়ে থাকেন। কিন্তু নীট্শের বিভিন্ন লেখনি অধ্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি এক এক গ্রন্থে এমনকি একই গ্রন্থে নানা পদ্ধতিতে কথা বলছেন। অত্যন্ত সচেতন ও প্রজ্ঞাবাদ পাঠক ছাড়া তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যের সাথে স্থিরভাবে বিচারপূর্ণ মন নিয়ে অগ্রসর হওয়া মুশকিল। তাঁর এই বহুমুখি প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত লেখক বলেন:

> Sometimes it feels as if Nietzsche is shouting at you, sometimes that he is whispering something frofound in your ear. Often he wants the reader to collude with him, as if he is saying that you and I know how things are, but those foolish people over there are all suffering from delusions.[১]

প্রকৃতই, নীট্শে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে অর্থপূর্ণ (cognitive) দার্শনিক ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে ভাবব্যাঞ্জক ভাষা তথা কাব্যিক বা শৈল্পিক ভাষায় কথা বলেনা যার মধ্যে থাকে নানারকম আবেগীয় উক্তি, উপমা ও রূপক বর্ণনা। পাঠক অসতর্ক হলে ফাঁদে পড়তে পারেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাষার অর্থ যেভাবে গ্রহণ করা হয়, ঠিক একই দৃষ্টিতে যদি ভাবব্যাঞ্জক ভাষার অর্থ করার চেষ্টা করা হয় তবে তা শ্রেণিবিভ্রান্তি (category mistake)-এর স্বীকার হয়ে বিভিন্নভাবে confused হতে পারে। নীট্শে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হবার পেছনে তাঁর প্রকাশভঙ্গিকেই প্রধানত দায়ী করা চলে। তবে এর কোন মতই গুরুত্বহীন তা বলা চলে না। কেননা আগেই বলা হয়েছে যে, নীট্শেকে নানাভাবে এমনকি একই সাথে বিরোধপূর্ণভাবে দেখার সুযোগ তিনি নিজেই তৈরি করেছেন। আমরা নীট্শেকে যে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী হিসেবে অভিহিত করছি এটার বিপক্ষেও তাই বলার সুযোগ আছে। কিন্তু এ প্রবন্ধের এক পর্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো যে, সামগ্রিক বিবেচনায় নীট্শের মতবাদকে এমনকি সকল বিরোধমূলক বক্তব্যকে একটি মোরকে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় এই *'নান্দনিক অস্তিত্ববাদ'* হতে পারে সবচেয়ে নিরাপদ এবং অধিকতর সার্থক নামকরণ।

যাইহোক, এ পর্যায়ে আমরা নান্দনিক অস্তিত্ববাদ ব্যাখ্যা করতে চাই। প্রথমেই বলতে হয় যে, এই যৌগিক পদটি 'নান্দনিক' এবং 'অস্তিত্ববাদ' এই দুইটি শব্দের সমষ্টি। দর্শনের ইতিহাসে এর কোনটিই নতুন নয়, তবে এই

'নান্দনিক অস্তিত্ববাদ' একত্রিতভাবে একটি অভিনব সংমিশ্রন। এটি অস্তিত্ববাদিদের নন্দনতত্ত্ব নয়, বরং নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত এক ধরনের অস্তিত্ববাদী মতাদর্শ। এটি কোন নতুন মতবাদ না হলেও অস্তিত্ববাদের এই ধরনটি, অথবা নান্দনিক দৃষ্টিতে অস্তিত্ববাদী হবার বিষয়টি আলাদা করে বলা একটি নতুন অভিধান তৈরির দাবী করে। নান্দনিক অস্তিত্ববাদ হচ্ছে এমন ধরনের অস্তিত্ববাদী মতবাদ যা নান্দনিকতাকে অস্তিত্বে পৌঁছানোর বা অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। আমরা জানি, অস্তিত্ববাদ বিশেষকরে, পাশ্চাত্য দর্শনের ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি দার্শনিক আন্দোলনের নাম। সোরেন কিয়ার্কেগার্দ থেকে শুরু করে গ্যাব্রিয়েল মার্সেল, কার্ল ইয়েসপার্স, মার্টিন হাইডেগার, জ্যাঁ পল, সার্ত, আলবেয়র ক্যামু প্রমুখ দার্শনিকগণ সকলে অস্তিত্ববাদী হলেও তাঁদের দার্শনিক ভাবনার প্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নীট্‌শেও একজন অস্তিত্ববাদী। তাঁর দর্শনের সথে অন্য সকল অস্তিত্ববাদীদের চিন্তার ধরন ও প্রকাশভঙ্গির ব্যবধানটা আরও বেশি প্রশস্ত। তবে সকল অস্তিত্ববাদীদের দর্শনের এমন কিছু মৌলিক দিকে মিল আছে যার ভিত্তিতেই সকলকে একই দলভুক্ত করা হয়। সেই মৌলিক সাদৃশ্যের বিষয়গুলো হলো: ক. 'অস্তিত্ব' শব্দের বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান খ. অস্তিত্বকে সারধর্মের পূর্বগামী হিসেবে মনে করা গ. ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মবাদিতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ ঘ. ব্যক্তিমানুষের জীবনের নানামুখি সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকসমূহ তুলে ধরা ইত্যাদি। তবে এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেক অস্তিত্ববাদীদের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। অস্তিত্বকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ কেবল মানব সত্তার ওপরই প্রযোজ্য মনে করেন। কেননা, তাঁদের মতে, এটা একটি আত্মসচেতনতা সমৃদ্ধ আত্ম অতিক্রমনের অবস্থার নার্মা যা কেবলমাত্র মানুষের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু এই কথাটি বোঝানোর জন্য বিভিন্ন অস্তিত্ববাদী বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য, এমনকি, বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতার ওপর সকলে গুরুত্ব দিলেও এর উৎস এবং ব্যবহার সম্পর্কে অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা যায়।

যাইহোক, অস্তিত্ববাদীদের মূল আলোচ্য ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যার মধ্যদিয়েই আমরা বিভিন্ন অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে সাদৃশ্য যেমন খুঁজে পাই, তেমনি খুঁজে পাই তাঁদের স্বকীয়তার দিকসমূহকে। 'অস্তিত্ব' শব্দটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের মতো নীট্‌শেও একে কেবল বেঁচে থাকা সাধারণ কোন মানুষ বলে চিহ্নিত করেননি। বরং তিনি আত্ম-সচেতনতার মাধ্যমে আত্ম-অতিক্রমনকামী

মানুষকে বুঝিয়েছেন। তবে অন্য সকল দার্শনিকদের থেকে এই আত্ম-অতিক্রমনকারী মানুষের তিনি এক ভিন্ন ধরনের নাম এবং গুণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এই মানুষের যথার্থ তথা চূড়ান্ত অবস্থা হলোঃ "ubermensch". এই জার্মান শব্দটিকে ইংরেজিতে "Superman", "Overman", "Overhuman" ইত্যাদি নামে অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় একে আমরা "অতিমানব" বলতে পারি। এই অতিমানব নিজের যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে এমনভাবে বৃদ্ধি করার কাজে সচেতনভাবে নিজেকে উদ্দীপ্ত করবে যে তিনি সাধারণ মানুষের গড়পরতা জীবনতো দূরের কথা এক ঐশরিক জীবনের মতো ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াস গ্রহণ করবে। অবশ্যই তিনি ঈশ্বর বা কোন অতিপ্রাকৃতিক সত্তা হয়ে যাবেন না; তবে রূপক অর্থে তিনি তেমনটি অতিমানবিক গুণের অধিকারী করে তুলবেন নিজেকে। যে গুণ কোন সাধারণ মানুষ ধারণ করতে পারে না। তাই সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বিবেচিত হবেন এক অতিমানব বলে। জনাথন সুইফ্ট-এর *The Guliver Travels*-এ লিলিফুটেরা যেমনটি করে গালিভারকে তাদের মত কোন সত্তা বলে ভাবতে পারেনি, তেমনি সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে অতিমানবের পার্থক্য হবে ব্যাপকতর। যদিও গালিভারের মতো শারীরিক কাঠামো নীট্শের অতিমানবের না থাকলেও চলবে তবে শক্তি যোগ্যতা সর্বপরি ক্ষমতা লাভের অদম্য ইচ্ছা (will to power) দ্বারা চরমভাবে উদ্দীপ্ত অতিমানব সাধারণ মানুষের থেকে দেবত্বতুল্য দূরত্বে অবস্থান করবে।

নীট্শের এই অতিমানব তৈরির প্রকল্প তথা অস্তিত্ববান হবার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নান্দনিক চেতনাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলেই নীট্শের বিভিন্ন লেখায় প্রতীয়মান হয়। তাই নীট্শেকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলে চিহ্নিত করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। নীট্শেকে কেবল অস্তিত্ববাদী বললে যেমন তাঁর সমগ্র দর্শনের সাধারণ দিক তুলে ধরা হয় না; তেমনি তাঁকে তথাকথিত নাস্তিক অস্তিত্ববাদী বলে চিহ্নিত করলেও অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের দিকটি যথার্থভাবে বোধগম্য হয়ে তাঁর স্বকীয় অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। নীট্শেকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলা হলে অস্তিত্ববাদের ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় পদ্ধতির বিশেষত্ব চিহ্নিত হয় এবং তাঁকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা সহজতর হয়। অস্তিত্ববাদীদের অনেকেই সাহিত্যের মাধ্যমে দর্শন প্রকাশ করেছেন। তাঁরা শিল্পী হয়েও তাঁদের শিল্পের মধ্য থেকে দর্শন প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ দার্শনিক গ্রন্থ এবং শিল্পকর্ম বা সাহিত্য এই উভয় মাধ্যম দ্বারা অস্তিত্ববাদের প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। কিন্তু নীট্শের মতো এমনটি জোড়ালোভাবে শিল্পী হওয়াকে

অস্তিত্ববান হবার প্রক্রিয়া বলে কেউ পাশ্চাত্য জগতে তার পূর্বে ভেবেছেন বলে মনে হয় না। আমরা জানি, শিল্প হলো নান্দনিক চেতনার manifestation বা প্রকাশ। শিল্পের চেতনা যুক্তির নয়, হৃদয়ের চেতনা। প্লেটো শৈল্পিক চেতনাকে অযৌক্তিক বলে একে দর্শনের চেয়ে নিম্নমানের বলে মনে করেছিলেন। অন্যদিকে, এই চেতনাকে দৈবউন্মাদনার ফসল বলে অভিহিত করে একে মানবজীবনের জন্য বরং অগঠনমূলক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু প্লেটোর বিবেচনায় নান্দনিকতার যে দিকগুলো নঞ্র্থক বা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে নীট্শের নিকট সেই বিষয়গুলোই ভিন্ন নামে মানুষের জন্য আশির্বাদ বলে চিহ্নিত হয়েছে। নান্দনিক চেতনা বা শিল্প চেতনা অযৌক্তিক একথা মেনে নিয়েই নীট্শে এই চেতনার গুণকীর্তন করেছেন। শোপেনহাওয়ারের শিষ্য হিসেবে নীট্শে যুক্তির বদলে অযৌক্তিক চেতনাকেই মানবজীবনের যথার্থ চেতনা এবং 'অস্তিত্বশীল' হবার জন্য, অতিমানব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য সহজাত প্রবণতা নামক অযৌক্তিক চেতনাকেই দরকারী বলে মনে করেছেন। প্লেটো শিল্পী জীবনকে যেভখাবে উন্মাদনাময় বলেছেন নীট্শে এই উন্মাদনাকে "The intoxications of passion" বলে চিহ্নিত করে অস্তিত্বশীল তথা ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর আবশ্যিক মাধ্যম বলে চিহ্নিত করেছেন।

অস্তিত্ববাদ এক ধরনের জীবনদর্শন। জীবনের নানামুখি বাস্তবতা। সুখ, দুঃখ, হতাশা, আশা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, শূন্যতা-সার্থকতা ইত্যাদি বোধ নিয়ে এই দর্শনের কাজ। অস্তিত্বশীল হবার জন্য জীবনকে অনুভব করতে হয়, জীবনের অনুভব থেকে আসে জীবনকে উন্নত করার তাগিদ। আত্ম-অতিক্রমের ইচ্ছা। নীট্শের মতে, জীবনের উপলব্ধি এবং জীবনকে অগ্রগামী করার তথা আত্ম-অতিক্রমনের ইচ্ছা মূলত অনুভূতি ও আবেগ নির্ভর। যুক্তির ভূমিকা এখানে গৌণ। আত্ম-উপলব্ধির চেতনা প্রধানত অনুভূতি নির্ভর। এমনকি আত্ম-অতিক্রমের ভাবনা থাকে তিনি ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা (will to power) বলেছেন তাও অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। এই অনুভূতি তাঁর মতে, যুক্তি-বুদ্ধি, বিচারকেন্দ্রিক নয়; বরং অনুভূতি নির্ভর ইচ্ছার সফল। একে তিনি সামগ্রিকভাবে সহজাত প্রবণতার অংশ বলে চিহ্নিত করেছেন। শোপেনহাওয়ারের নিকট থেকে তিনি এই মতাদর্শ পেয়েছেন যে, জীবন মূলত ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যুক্তির দ্বারা নয়। নীট্শে এই ইচ্ছাকে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা বলে চিহ্নিত করেন। মানুষের মধ্যে কমবেশি এই ইচ্ছা বিদ্যমান। তবে কারো কারো মানসিকতা দাসসুলভ; তাদের মধ্যে ক্ষমতালাভের ইচ্ছা তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এদেরকে তিনি নিম্নমানের মানুষ বলে চিহ্নিত

করতে চান। অপরদিকে যাদের মধ্যে মানবসত্তার মূল প্রবণতা তথা ক্ষমতালাভের ইচ্ছা প্রবল তাদেরকে তিনি অস্তিত্বের অভিমূখে চলমান উন্নততর মানুষ বলে অভিহিত করেন। নান্দনিকবোধ অনুভূতি নির্ভর। আমরা জানি, নন্দনতত্ত্বকে অনেকে ইন্দ্রিয় আবেগীয় বিদ্যা বলেও চিহ্নিত করেন। নান্দনিক অনুভূতির মাধ্যমেই মানুষ নিজের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হতে পারে। নিজের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ জন্য দরকার জীবনের বিষয়গুলো আবেগঘনভাবে উপলব্ধি করা। জীবনকে যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে এর হিসেব মিলানো যাবে না বলে তিনি মনে করেন। জীবনের অগ্রায়ন চিন্তাও আবেগের ফসল। সহাজত ইন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে মানুষ জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। একজন শিল্পী যেমন জীবনকে বা প্রকৃতিকে আবেগীয় চোখ বা অনুভূতির চোখে দেখে, জীবনের প্রতি সেই শৈল্পিক দৃষ্টি না দিলে জীবন সম্পর্কে যথার্থ অনুভব লাভ করা যায় না। আত্ম-অতিক্রমনের প্রেরণা লাভ হয় মূলত আবেগীয় শৈল্পিক চেতনা থেকেই।

জীবনের যা কিছু সহজাত স্বাভাবিক তার ওপর নির্ভর করাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন নীট্‌শে। তিনি দেখাতে চান যে, যুক্তি মানুষের একান্ত সহজাত তথা প্রাথমিক স্তরের গুণ নয়, বরং অনুভূতিই হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী সহজাত গুণ। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যুক্তির বদলে প্রাথমিকভাবে আবেগ-অনুভূতি দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়। নীট্‌শের মতে, মানুষের যুক্তি প্রয়োগের বিষয়টি আসে তখন যখন অন্য সকল উপায়, বিশেষকরে সহজাত বৃত্তির নিকটবর্তী বিষয়গুলো তথা অনুভূতি, আবেগ, কল্পনা ইত্যাদি দিয়ে কোন কিছুকে অর্জন করতে ব্যার্থ হয়। তাঁর ভাষায়: “One chooses logical argument only when one has no other means.”[২]

মানুষ যা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করে তার উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাই মানুষের জন্য বেশি লাভজনক বলে নীট্‌শে মনে করেন। স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত সহজাত প্রবণতা হিসেবে আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ইত্যাদির শৈল্পিক তথা নান্দনিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপরই নীট্‌শে গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্যক্তিমানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আবেগ-অনুভূতি কমবেশি অনুশীলন করলেও তাকে নান্দনিক করে উপস্থাপন বা ব্যবহার করার বিষয়টি সকলের বোধগম্য নয়। তিনি তাই সাহিত্য তথা শিল্পকর্মের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। জগত ও জীবনকে নান্দনিকভাবে দেখা, জীবনের সুখ-দুঃখ, সমস্যা-সম্ভাবনাকে একজন যথার্থ নায়কের দৃষ্টিতে দেখতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন নীট্‌শে।

উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রাচীন গ্রিক ট্রজেডির নায়কদের জীবন লক্ষ করতে বলেন। একজন ট্রাজিক নায়ক সাহসের সাথে, আবেগের সাথে, ইচ্ছাশক্তির সাথে জীবনের সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। জীবনের সার্বিক রূপ তার নিকট হাসি-কান্নায় জড়িত একটি নায়ক, এই বোধ থেকে তিনি যতক্ষণ কোন দুঃখকে অস্বাভাবিক মনে করেন না, বরং দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুভূতি বা আবেগ সে লালন করে। নীট্শে বলেন: "The tragic artist is no pessimist: he is precisely the one who says Yes to everything questionable, even to the terribleĺ he is Dionysian."[৩]

জীবনকে যদি দুঃখময় হিসেবে ধরে নিয়ে সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলেই দুঃখকে জয় করা যায়। এজন্যই তিনি গ্রিক ট্রাজিক হিরোদের অনুসরণ করতে বলেছেন। নীট্শে কোনভাবেই শূন্যবাদী (nihilist) ছিলেন না। কেননা জীবনকে তিনি সার্থক করার কথা বলেছেন। জীবনে সার্থক হওয়া যায় না, বা জীবনের কোন মূল্য নেই, জীবনের হিসাব সবই শূন্যI এমন কথা তিনি বলেননি। তিনি বরং বলিষ্ঠভাবে বাঁচার কথা বলেছেন, বীরের মত বাঁচার কথা বলেছেন। আর এজন্য তিনি গতানুগতিক বৌদ্ধিক চর্চা (reasoning), নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বদলে এক ধরনের কঠোর (radical) পুনর্বিবেচনার বিষয়টির মধ্যে চিরাচরিত মানবজীবনকে মাঝে মধ্যেই কটাক্ষ করেছেন বলে অনেকে তাঁর মতবাদকে মানববিদ্বেষী (misanthropic) চিন্তা বলেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। তবে এ ধরনের সমালোচনা সঠিক নয় বলেই মনে হয়। কেননা নীট্শে যে মানুষকে কটাক্ষ করেছেন সে মানুষ তাঁর ভাষায় মনুষত্বের প্রকৃত মর্যাদা রাখার বিষয়ে অক্ষম বা অনাগ্রহী, তারা এক ধরনের দাস মানসিকতার বাহক। জগত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করুক বা সমাজ ও বাস্তবতার চাপে পরে মানুষ নিজের স্বকীয়তা এবং উন্নতি হবার আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করুক এমনটি নীট্শে অনুমোদন করেন না। বরং তিনি মনে করেন যে, সর্বাবস্থায়ই মানুষ নিজেকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে পারে। ক্ষমতালাভের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ আত্ম-অতিক্রমনের চেষ্টা করতে পারে; এবং তাঁর মতে, এটিই হচ্ছে মানুষের মূল কাম্য কাজ। অন্যথায় মানুষ হবার সার্থকতা থাকে না। তাঁর মতে, মানুষই জগতকে অর্থ প্রদান করবে, জগত মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করবে না। ভাষা ও ধারণা দ্বারা মানুষ জগতের সবকিছুর অর্থ নির্ধারণ করে। নীট্শে মানব প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল ঠিকানা। নীট্শে ঘোষণা করেন: "Nothing is beautiful, except for man alone: all aesthetics rests upon this naiveté."[৪] তিনি

আরও বলেন: "Nothing is ugly except the degenerating man."[৫] তাঁর মতে, মানুষ যদি তার স্বভাবসুলভ বা স্বকীয় বৃত্তিগুলো তথা ক্ষমতালাভের ইচ্ছা, সাহস ও গর্ববোধ হারিয়ে ফেলে তাহলেই সেই মানুষ নীচু অবস্থানে চলে যায়, অন্যদিকে এগুলো জাগ্রত করার মধ্যেই রয়েছে সৌন্দর্য, রয়েছে জীবনের সার্থকতা। নীট্শের ভাষায়: "His feeling of power, his courage, his prideĺ all fall with the ugly and rise with the beautiful."[৬] নীট্শের মতে, মানুষ যদি সাহস, ইচ্ছাশক্তি উন্নত মানবসত্তার সার্থক গর্ব নিয়ে জীবন সংগ্রামে শৈল্পিকভাবে নায়কসুলভ কর্ম নিয়ে অগ্রসর হয়া তাহলে তার সমগ্র জীবনটাই হয়ে উঠতে পারে শিল্পসদৃশ্য। জীবনকে শৈল্পিকভাবেই অগ্রসর করাতে হলে এক ধরনের 'উন্মাদনা বা প্রবল উত্তেজনা (frenzy) থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, এমন গুণের অধিকারী হতে হবে যে গোটা জগত ও জীবনকে নান্দনিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে এবং তার মধ্য থেকে এমন এক মাদকতা অনুভব করা সম্ভব হবে যা তাকে আত্ম-অতিক্রমের পথে উল্মাদের মত অগ্রসর হতে অহর্নিশি তাড়িত করবে। নীট্শে বলেন:

> If there is to be art, if there is to be any aesthetic doing and seeing, one physiological condition is indispensable: frenzy. Frenzy must first have enhanced the excitability of the whole machine; else there is no art.[৭]

নীট্শের এই frenzy বা প্রবল উত্তেজনা দৈহিক কর্মকাণ্ডের সাথে এমনভাবে মিশে থাকবে বলে তিনি মনে করেন যে, এটি ব্যক্তিকে শৈল্পিক কর্মে নিবেদিত করবে এবং তার জীবনকে নান্দনিক করে তুলবে। এই নান্দনিক জীবন তথা শৈল্পিক জীবনই, তাঁর মতে, যথার্থ অস্তিত্বের অবস্থা। তাই নীট্শের অস্তিত্ববাদকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদ বলাই শ্রেয়। অস্তিত্বশীল হতে হলে যে আত্ম-অতিক্রম করতে হয় তা ঐ প্রবল উত্তেজনামূলক অবস্থার মাধ্যমেই শৈল্পিকভাবে অর্জিত হতে পারে। তাঁর মতে, শৈল্পিকতাই সার্থকতার বাহক। এজন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পসমূহ উপভোগ ও অনুসরণ করা দরকার; এবং নিজের জীবনকেও তদ্রূপভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। নীট্শে বলেন: "In art man enjoys himself as perfection."[৮] তথা শিল্পের অনুসরণ শৈল্পিকতার মধ্য দিয়েই মানুষ আত্ম-অতিক্রমের অবস্থা লাভ করতে পারে। তিনি বলেন:

> "Through art, Man transcends the confines of his own ego and secures oneness with the universe. Clearly, it is

> established: the role of art as means of self-transcendence."[৯]

তবে শিল্পের মধ্যে সব শিল্পই মানবজীবনের জন্য সমান গুরুত্ব বহন করে না। জীবনের অগ্রগতির জন্য তাই সব ধরনের শিল্প সমানভাবে কার্যকর নয়। নীট্শে প্রাচীন গ্রিসের শিল্প প্রচেষ্টা এবং শৈল্পিক মানসিকতার দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। শিল্পের মধ্য দিয়ে কীভাবে মানুষের উন্নতি হতে পারে তা অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করেই তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ *The Birth of Tragedy* শুরু করেছেন। তিনি বলেন:

> We shall have gained much for the science of aesthetics, once perceive not merely by logical inference, but with the immediate certainty of vision, that the continuous development of art is bound up with the Apollonian and Dionysian dualityÍ just as procreation depends on the duality of the sexes, involving perpetual strife with only periodically intervening reconciliations.[১০]

প্রাচীন গ্রিক শিল্পের মধ্যে দুই ধরনের শিল্পকে নীট্শে পর্যালোচনা করেন, তা হলো: এ্যাপোলনীয় শিল্প (Apollonian art) এবং ডাইনিসিয়ান শিল্প (Dionysian art)। আমরা জানি, এ্যাপোলো এবং ডাইনিসিয়াস হচ্ছেন প্রাচীন গ্রিক উপাখ্যানের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। এই দুই দেবতা বিভিন্ন রকমের শক্তি ও গুণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও নীট্শে এদের গুণসমূহের মধ্যে মৌলিক দিকের সন্ধান করে দেখান যে, এদের মধ্যে এ্যাপোলো হলেন ধীর-স্থির যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধির (cool rational intellect)-এর প্রতীক এবং ডাইনিসাস হচ্ছেন মাদকতাপূর্ণ প্রবল আবেগীয় (intoxicated passionate emotional) সত্তার প্রতীক। তাই যে সকল শিল্পের মধ্যে ধীর-স্থির যুক্তি-বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে তাকে তিনি এ্যাপোলনীয় শিল্প বলেছেন; অন্যদিকে যে শিল্পের মধ্যে মাদকতাপূর্ণ প্রবল আবেগীয় দিকের প্রকাশ ঘটেছে তাকে তিনি ডাইনিসিয়ান শিল্প বলে অভিহিত করেছেন। তৎকালীন গ্রিসীয় সংস্কৃতিতে এই উভয় ধারার শিল্প চেতনার সমন্বয় তিনি লক্ষ করেন। তিনি দেখান যে, প্রাচীন গ্রিক ট্রাজেডির মধ্যে এ্যাপোলনীয় ও ডাইনিসিয়ান ধারার সুসমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ট্রাজেডির নায়কগণ কখনই জীবনকে ধীর-স্থিরমূলক যুক্তিনিষ্ঠ বলে গ্রহণ করেননি। ঘটনার যৌক্তিকতা ধারাবাহিকতা এবং কার্যকারণ শৃঙ্খলা ট্রাজেডিতে থাকলেও এসব কিছু ছাপিয়ে প্রবল আবেগপূর্ণ এক সাহসী সত্তার বলিষ্ঠ প্রকাশই প্রাধান্য পেয়েছে ট্রাজিক

হিরোদের জীবনে। জীবনের সকল বাস্তবতাকেই তারা জয় করতে সচেষ্ট ছিলেন। তা যতই কঠোর এবং অবধারিত হোক না কেন। নীট্শের মতো ট্রাজিক শিল্পের এই চেতনা ব্যক্তিমানুষের জীবনকে আলোকিত করতে পারে। এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় মানবজীবনের যথার্থ অস্তিত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার শিক্ষা তথা আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে আত্ম-অতিক্রমের আদর্শ। তিনি তাই উপর্যুক্ত দুই শিল্পধারার মধ্যে ডাইনিসিয়ান ধারারই পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

যুক্তিযুক্ত স্থির বুদ্ধি জাত শিল্পচেতনা এক পর্যায়ে গ্রিক দার্শনিক কর্মকাণ্ডকেও প্রভাবিত করে। এর ফলে অর্থাৎ এ্যাপোলনীয় ধারার আদলে দার্শনিক কর্মকাণ্ড, বিশেষকরে, সক্রেটিস-প্লেটোর ডায়ালগ নির্ভর দার্শনিক শিল্পের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতে থাকে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায়। অন্যদিকে, চারুশিল্পের অন্যান্য দিক, বিশেষকরে, নাট্য-সংগীত (chorus) অথবা যে কোন সংগীতে ডাইনিসিয়ান ধারার প্রাধান্য টিকে থাকে বলে নীট্শে বর্ণনা করেন। তিনি সক্রেটিস প্রমূখ গ্রিক দার্শনিকদের স্থির যুক্তি-বুদ্ধির তাবেদারীত্ব করার জন্য অভিযুক্ত করেন। নীট্শের মতে, তাঁরা নান্দনিকতাপূর্ণ জীবনের সামঞ্জস্য এবং আবেগীয় উদ্দামকে ভুলে কেবল যুক্তির আনুগত্য করেছেন। যে যুক্তি মানবসত্তার মূল চেতনা এবং অস্তিত্বের একান্ত দাবী মিটাতে পারে না। তাঁর মতে, অতিমাত্রায় যুক্তিবাদিতা মানুষের জীবনকে হিমায়িত করে তোলে, জীবনের উদ্দাম-উচ্ছ্বলতা ম্লান করে দেয়, শেষ পর্যন্ত মানুষকে করে তোলে হাস্যকর এক নিম্নমানের জীব। তিনি সক্রেটিসকে ভাঁড় (buffoon) বলেও কটাক্ষ করেন। সক্রেটিস-প্লেটো ডায়ালগের মাধ্যমে দর্শনচর্চা করতেন। ডায়ালগ বা সংলাপ এক ধরনের সাহিত্য হিসেবে প্রকাশিত হলেও বা বৃহত্তর অর্থে এটাকে এক ধরনের শৈল্পিকতা বলা হলেও উল্লেখিত সংলাপের মূল চলিকাশক্তি ছিলো যুক্তি। যুক্তির দ্বারা কোন কিছুর অর্থ, সংজ্ঞা নির্ণয় এবং কোন মতাদর্শ বা নীতিতে পৌঁছানোই ছিলো এই ধরনের ডায়ালগের মূল বৈশিষ্ট্য। সক্রেটিসীয় আয়রণী বা শ্লেষমূলক পদ্ধতিকেও নীট্শে অত্যন্ত নেতিবাচক বিষয় বলে চিহ্নিত করেন। গ্রিকদের বীরত্বপূর্ণ মনোভাব এবং আবেগ-অনুভূতি নির্ভর সৃজনশীল চেতনাকে সক্রেটিস নষ্ট করে দিয়েছেন বলে নীট্শে জোড়ালোভাবে অভিযোগ করেন। যেমন তিনি বলেন:

> With Socrates, Greek taste changes in favor of logical argument. What really happened there? Above all, a noble taste is vanquished; with dialectics the plebs come to the top. Before Socrates, argumentative conversation was repudiated in good society; it was considered bad manners, compromising. The young were warned against it. Furthermore, any presentation of

> one's motives was distrusted. Honest things, like honest men, do not have to explain themselves so openly. What must first be proved is worth little. Wherever authority still forms part of good bearing, where one does not give reasons but commands, the logician is a kind of buffoon: one laughs at him, one does not take him seriously. Socrates was the buffoon who got himself taken seriously: what really happened there?[১১]

নীট্শে দেখাতে চান যে, যুক্তি সক্রেটিস প্রমুখ জ্ঞানীদের ভুল পথে পরিচালিত করেছে। যুক্তি ব্যবহার করে যে ডায়ালগ তৈরি হয়েছে তা মূলত প্রতিপক্ষকে ঠকানোর জন্য বা কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ব্যবহৃিত হয়ে থাকে বলে নীট্শে মনে করেন।[১২] তাঁর মতে, যুক্তি বিরক্তিকর একটি বিষয়। কেউ সাধারণত একে ভালোবাসেনা। শিয়ালের মত ধুর্ত মানুষেরাই এটা ব্যবহার করে। তবে এটা এক ধরনের অসুস্থতা, দূর্বলতা, এমনকি কাপুরুষতা। তাঁর মতে, যাদের আত্মরক্ষা করার অন্য কোন পথই থাকে না তারাই কেবল যুক্তি ব্যবহার করে থাকে। যুক্তি হচ্ছে মানুর্ষের শেষ হাতিয়ার। তবে মজার বিষয় হলো যুক্তি বাতিলযোগ্য। সহজেই একে বাতিল হতে দেখা যায়। যুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি হাজির হয়। (Ibid) এটি নিতান্তই তর্কে জেতার জন্যে। প্রজ্ঞাবান বলে পরিচিত সক্রেটিসকে নীট্শে পঁচা মাংশের লোভে আকৃষ্ট দাড়কাকের সাথেও তুলনা করেন। তিনি ব্যঙ্গের ছলে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন: "Could it be that wisdom appears on earth as a raven, attacted by a little whiff of carrion?"[১২] সক্রেটিসকে তিনি প্রকৃত গ্রিক বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন। তাঁর মতে, সক্রেটিস এক নিম্নশ্রেণির ইতর প্রকৃতির লোক (plebeian)। তাঁর আকার-আকৃতি তথা চেহারা নিয়েও তিনি সমালোচনা করেন। এবং এক পর্যায়ে নীট্শে তাঁকে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন অসুস্থ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এমনকি সক্রেটিসের মৃত্যুর ব্যাপারেও তিনি রাষ্ট্র বা গ্রিক প্রভাবশালীদের দায়ী না করে সক্রেটিসকেই দায়ী করেন। তিনি দেখান যে, সক্রেটিস দীর্ঘ জীবন বাঁচতে চাননি। কেননা তিনি মনে করতেন যে, জীবন দীর্ঘায়িত হওয়ার অর্থই হলো দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে অধিককাল ভোগান্তির শিকার হওয়া।[১৩]

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে নীট্শের আপত্তিসমূহ অনেকটাই আক্রমনাত্মক এমনকি অশোভনও বটে। তবে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিলো এটা দেখানো যে, অতিমাত্রায় যুক্তিবাদিতা মানুষের জন্য কোন মঙ্গলকর বিষয় নয়। মানুষের সৃজনশীলতার জন্য আবেগ অনুভূতির প্রশ্রয় প্রদান জরুরি। সক্রেটিসীয় যুক্তিবাদিতা মানুষকে

সৃজনশীলতার গুণকে নষ্ট করে। সৃজনশীলতার জন্য দরকর নান্দনিক অনুভূতি, নান্দনিক চেতনা এবং এক ধরনের গভীর হৃদয়াবেগ যা মানুষকে তার স্বভাবসূলভভাবেই লালিত করে স্বকীয় অনুভূতিকে তীব্রভাবে জাগ্রত করবে এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করবে এক ধরনের আবেগীয় উন্মাদনা যা তাকে আত্মঅতিক্রমের দিকে ধাবিত করবে। এভাবেই মানুষ হয়ে উঠবে 'অস্তিত্বশীল'। তাই এই অস্তিত্বকে অবশ্যই নান্দনিকভাবে উদ্দীপ্ত অস্তিত্ব বলা চলে। আর সেকারণে নীট্শেকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলাই শ্রেয়।

সক্রেটিক নান্দনিক অনুভূতিকে অবজ্ঞা করে যুক্তির দাসত্ব করার পথ উন্মুক্ত করেছেন বলে নীট্শে যে, অভিযোগ করেন, সেই দাসত্বের গ্লানি তিনি আধুনিক ইউরোপেও লক্ষ করেন। এমনকি তাঁর সমসায়িক ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চাও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অতি আশ্বস্ত (over optimistic) ছিলো বলে নীট্শে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন যে, এই ধরনের আবহাওয়া মানুষের অগ্রগতি, এমনকি, তার প্রকৃত অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রতিবন্ধকতামূলক। যুক্তিনিষ্ট দর্শন এবং পরীক্ষাণাত্মক বিজ্ঞান এ যুগে মানুষের জ্ঞানচর্চা ও জীবন চেতনার অগ্রগতির বদলে এক ধরনের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে গিয়েছে। আলোকিত যুগ (the age of enlightenment) বলে অভিহিত আধুনিক ইউরোপীয় স্বভ্যতায় বিজ্ঞান ও দর্শন অনেক সাফল্য আনলেও জীবনের মূল চেতনাকে (নান্দনিক চেতনা) হিমায়িত করে এক জটিল এবং দাসত্বমূলক চেতনায় আবিষ্ট করে ফেলেছে। এই অবস্থা মানব প্রগতির জন্য মোটেই ইতিবাচক নয় বলে নীট্শে দেখাতে চেয়েছেন। তাই তিনি এই যুক্তি ও প্রমাণের গণ্ডির বাইরে এসে নতুন এক জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞানীয় চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন; তিনি মনে করেছিলেন যে, এই তথাকথিত যুক্তি মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না, বিজ্ঞান এনে দিতে পারবেনা শান্তি। তাই তিনি প্রচলিত দর্শন ও বিজ্ঞানকে সন্দেহ করে নতুন জ্ঞান ও চেতনার অনুসন্ধান করেন। তিনি তাঁর *The Birth of Tragedy* গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের উপসংহার টানতে গিয়ে বলেন:

> But now, spurred on by its powerful illusion, science is rushing irresistibly to its limits, where the optimism essential to logic collapses. For the periphery of the circle of science has an infinite number of points, and while it is as yet impossible to tell how the circle could ever be fully measured, the noble, gifted, man even before reaching the mid-course of his life, inevitably reaches that peripheral boundary, where he finds himself staring into the inevitable. If he sees here, to his dismay, how logic twists around itself and finally, bites itself in the tail,

> there dawns a new form of knowledge, which needs art as both protection and remedy, if we are to bear it.[১৪]

জ্ঞানের জন্য তিনি যে নতুন প্রচেষ্টা এবং অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে চান তার জন্য তিনি শৈল্পিক তথা নান্দনিক প্রক্রিয়াকেই অনুমোদন করেন। আর এর নমুনা হিসেবে তিনি ডাইনসিয়ান আর্টকেই গ্রহণ করতে চান। তিনি তথাকথিত আধুনিকতা (modernity)'র মধ্যদিয়েও এক ধরনের তেজ্বদ্বীপ্ত ট্রাজিক হিরোর স্পিরিট নিয়ে তুমুল ভাবাবেগে উদ্ধুদ্ধ এক নতুন জ্ঞান ও মূল্য নির্ধারণের প্রয়াস সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেন। যুক্তি-বুদ্ধি প্রমাণের তথাকথিত আবশ্যিক নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ না হয়ে মানুষকে তিনি শিল্পীর চোখ দিয়ে জীবনকে দেখতে বলেন। শিল্পীর চোখ অর্থ নান্দনিক অনুভূতি এবং এই অনুভূতির মাধ্যমে সেই প্রাচীন গ্রিসেও শিল্পীরা সৃষ্টি করেছিলেন নানারকম কল্পকাহিনী (myth)। এই সকল কল্পকাহিনী কেবল কল্পনানির্ভর মিথ্যা কাহিনী প্রকাশ করে না, নীট্শের মতে, এটি মানুষের নান্দনিক উপলব্ধির ফসল। মানবপ্রকৃতির স্বকীয় দিক থেকেই এটি প্রবল আবেগের সাথে উঠে এসেছে। মানবজীবনের পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এর গুরুত্ব ব্যাপকত। তিনি মনে করেন যে, প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতির এইসব কল্পকাহিনী রচনার প্রক্রিয়াকে অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। তথাকথিত আলোকিত যুগ বা আধুনিক যুগে এসকল কল্পকাহিনীকে অবমূল্যায়ন করা হয়। এই অবমূল্যায়ন আধুনিক মানুষেদের স্বকীয় সৃজনী ক্ষমতাকেই হ্রাস করে দিচ্ছে বলে নীট্শে অভিযোগ করেন। কল্পকানিহী তথা কল্পনাশক্তির অবমূল্যায়নের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, এই অবস্থায়: "...all culture loses its healthy and natural creative power."[১৫] তাঁর মতে, মানুষের জীবনে সত্যিকার অগ্রগতি নির্ভর করে নিতান্তই বাস্তবতার ওপরন নয়, বরং বাস্তবতাকে অতিক্রম করে, কল্পনার দ্বারা আবেগের দ্বারা বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে বা ছাপিয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়েই আসে মানব প্রগতি। কেবল প্রগতি নয়, তৈরি হয় আত্ম-অতিক্রমের অবস্থা যা একজন অস্তিত্ববাদীর জন্য সবচেয়ে বড় কাম্য। কল্পনা ও আবেগের এই চমৎকার জগত সৃষ্টি করতে পারলে মানুষ তার মধ্যে নিজেকে দরকার মতো নিমগ্ন করে প্রাত্যহিত জীবনের অসঙ্গতি ও যন্ত্রণাকে লাঘব করতে সক্ষম হতো বলে নীট্শে মনে করেন। আর এরকম কল্পনাকে আবেগকে উন্নতি করতে এক ধরনের সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য (cultural health) দরকার। কিন্তু তিনি দেখান যে, গ্রিক মীথ সহ এধরনের কল্পকাহিনী আধুনিক যুক্তিবাদীরা ও বিজ্ঞানচর্চাকারীরা অবজ্ঞার সাথে অবদমন করে চলছে, যার ফলে মানুষের যন্ত্রণা এড়ানোর কোন নিরাময়ালয় অথবা

সাময়িকভাবে আশ্রয় নেওয়ার জন্যও বিকল্প কোন গৃহ বা আবাস আর থাকছে না। নীট্শে বলেন:

> And here stands man, stripped of myth eternaly, in the midst of all past ages, digging and scrabbling for roots, even if he must dig for them in the most remote antiquities. What is indicated by the great historical need of unsatisfied modern culture, clutching about for countless other cultures, with its consuming desire for knowledge. If not the loss of myth, the loss of mythical home, the mythical womb?[১৬]

তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক অথবা বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে জ্ঞানচর্চা অনেকটা বৈষয়িক জীবনের পণ্য সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে বলে নীট্শে পর্যপেক্ষণ করেন। তিনি দেখান যে, এই সংস্কৃতিতে মানুষ হয়ে পড়েছে অর্থলিপ্সু, স্বার্থলিপ্সু, পরস্পর অবিশ্বস্ত সত্তা। নীট্শে কটাক্ষ করে বলেন, "... man is now more evil than ever. I do not understand this: why should man be more distrustful and evil now? Because he now has a scienceÍ needs a science."[১৭]

নীট্শের মতে, অন্যান্য প্রাণির থেকে মানুষের প্রধান পার্থক্য কেবল যুক্তিনিষ্ঠ জীবÍ এমনটি নয়। এযাবৎকাল, বিশেষকরে, এ্যারিস্টটলের পরবর্তীতে মানুষের বিভেদক লক্ষণ (differentia) হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিকে ধরা হয়ে থাকে। কেননা এই গুণটি মানুষকে অন্যান্য প্রাণি থেকে আলাদা করে। অন্যান্য প্রাণি মানুষের মতো উন্নত বা গঠনমূলক চিন্তা তথা যুক্তিগঠন করতে পারে না। এ্যারিস্টটল মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়েও তাই মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবে উল্লেখ করেন বলেন। "(Man is a rational animal.)" এ বিষয়ে এ্যারিস্টটলের সাথে দার্শনিক ও যে কোন চিন্তাশীল মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই একমত। কিন্তু নীট্শে এ্যারিস্টটলীয়ান হতে পারেন নি। তিনি বরং ফরাসী লেখক লা রোশফুকোর মতো মনে করতেন যে, 'নিজের সমস্ত যুক্তির অনুসরণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।'[১৮] বরং, তাঁর মতে, আবেগ ও কল্পনার দ্বারাই মানুষ হয়ে উঠতে পারে যথার্থ অস্তিত্বশীল সার্থক মানুষ। মানুষ নিজেকে যুক্তির দ্বারা পরিবর্তন করে না, বরং আবেগ ও কল্পনার দ্বারা মানবসত্তা অন্যান্য জীবের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে জীবনে গৌরবান্বিত হয়। নীট্শে বলেন:

> Man has gradually become a fantastic animal that must fulfil one condition to existence more than any other animal: man must form time to time believe he knows why he exist his race

> cannot thrive without a periodic trust in lifeĺ without faith in the reason in life![১৯]

আধুনিক বা আধুনিকোত্তর যুগে মানব অস্তিত্বের নানামুখি সমস্যা ও কঠোর বাস্তবতায় যুক্তিবুদ্ধি পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ মানুষকে শান্তি দিতে পারেনি। বরং, নীট্শের পর্যবেক্ষণে, মানবজীবন আগের যে কোন সময়ের চাইতে আরও জটিল, অনিশ্চিত এবং অনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। মানুষের কল্পনাশক্তি দিয়ে আবেগনির্ভর মানসিক জগৎ সৃজন করতে না পারলে এবং সম্ভব মত সেই কল্পজগতে হারিয়ে যেতে না পারলে জাগতিক কল্পনা থেকে মুক্তির কোন সহজ রাস্তা নেই বলে নীট্শে মনে করতেন। তাঁর এই ভাবনা শিল্পজগতের বা সাহিত্যজগতের রোমান্টিকদের ভাবনার সাথে অনেক দিক থেকেই সাদৃশ্যপূর্ণ। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের অন্যতম প্রাথমিক উদ্যোক্তা সেমুয়েল টেইলর কোলরীজ (১৭৭২-১৮৩৪)-এর *Kubla Khan* কবিতায় কল্পনার জগতের এমন একটি 'ইমেজ' সৃজন করা হয়েছে। মঙ্গোলিয়ান সম্রাট কুবলা খানের নামে মানকরণ করা এই কবিতার কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করার মূল চরিত্র কুবলা খান। তিনি তার রাজধানী জানাডু'তে এমন একটি প্রমোদ প্রসাদ নির্মাণের নির্দেশ দেন (কল্পনা করেন) যা বাস্তবে সম্ভব না হলেও আমাদের ভাবনাকে তৃপ্ত করতে উজ্জীবিত করতে এবং আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। Kubla Khan কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে:

> In Xanadu did Kubla Khan
> A stately pleasure dome decree:
> Where Alph, the sacred river, ran
> Through caverns measureless to man
> Down to a sunless sea.
> So twice five miles of fertile ground
> With walls and towers were girdled round:
> And there were gardens bright with sinuous rills,
> Where blossomed many an incense-bearing tree;
> And here were forests ancient as the hills,
> Enfolding sunny spots of greenery.[২০]

কবিতার একটি পর্যায়ে তিনি এক আবিসিনিয়ান কুমারী মেয়ের রূপকল্প তৈরি করেন এবং বলেন:

> A damsel with a dulcimer
> In a vision once I saw;
> It was an Abyssinian maid,

And on her dulcimer she played,
Singing of Mount Abora.
Could I revive within me
Her symphony and song,
To such a deep delight 'twould win me,[২১]

যাইহোক নীট্শে মনে করতেন যে, জীবনের জন্য কল্পনা-আবেগ খুবই জরুরি বিষয়। আবেগ থেকেই আসে কল্পনা এবং সেই কল্পনার জগতে মানুষ স্বাধীনভাবে অবগাহন করে নিজের বাস্তবজীবনের নানামুখি জটিলতাকে এড়িয়ে একটু স্বস্তি লাভ করতে পারে। এই নিরাপদ আশ্রয় বা একটি বিকল্প জগৎ মানুষ যদি সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে বৈষয়িক জীবনের নানা জটিলতা জগৎ সংসারের বিভিন্ন অমঙ্গল মানুষকে এমনভাবে চেপে ধরবে যে যুক্তি বুদ্ধি-হিসাব-নিকাশ কোনটাই সঠিকভাবে সমাধান নিয়ে আসবে না। এমনকি শান্তনা দিতেও যুক্তি ব্যর্থ। বরং যুক্তি জীবনের আবশিক্য অনেক অশুভ পরিণতির বিষয় অনুমিত করে আরও বেশি আশাহত করে তুলতে পারে। তাই এক্ষেত্রে আবেগ ও আবেগ নিঃসৃত কল্পনা অনেক সময় দুর্যোগময় অন্ধকার জীবনে আশার আলো সঞ্চার করতে পারে। নীট্শে তাই মনে করেন, 'আবেগহীন জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন' [life, wittont emotion, is bleak] নীট্শে একজন অস্তিত্ববাদী হিসেবে দেখান যে, কল্পনার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে বিভিন্নভাবে আবিষ্কার করতে পারে। নীট্শের মতে, এই ধরনের আবিষ্কার নিজেকে নতুন করে বা নানারূপে সৃজন করার শামিল। এই সৃজন করার স্বাধীনতা যেমন দরকার তেমনি নিজেকে বোঝার বিষয়টিও প্রয়োজন অস্তিত্বশীল হবার জন্য। বুঝতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝি। কিন্তু যুক্তি আমাদের অনুভূতি তথা সহজাত অনেক প্রবণতার ক্ষেত্রে সদয় ব্যবহার করে না। অথচ মানুষকে, বিশেষকরে, নিজেকে বুঝতে হলে নিজের আবেগ-অনুভূতি, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা ইত্যাদিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে হবে। এই অনুভব যুক্তির হিসেবের বাইরে থেকে যায় অধিকাংশ সময়ে। নান্দনিক অনুভবই এটাকে যথার্থভাবে বুঝতে পারে। এই নান্দনিক অনুভব মানুষের হৃদয়ের অনুভব। মানুষ নিজের আবেগ-অনুভূতির পর্যাপ্ত মূল্য দিয়ে স্বাধীন কল্পনার মাধ্যমে নতুন কিছু, উন্নত কিছু হয়ে উঠতে তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হলেই সেই মানুষ, নীট্শের মতে, হয়ে ওঠে প্রকৃত অস্তিত্বশীল। তাই এই প্রক্রিয়ায় অস্তিত্বের রূপায়নকে আমরা নান্দনিক অস্তিত্ববাদ বলে অবিহিত করতে পারি।

নীট্শের নান্দনিক অস্তিত্ববাদ অস্তিত্ববাদী প্রচলিত ধারার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোন দার্শনিক অভিমত নয়। বরং সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শনের যে সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধরা হয় যেমন ব্যক্তিবাদিতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-অতিক্রম, জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ ইত্যাদি সবই নীট্শের ভাবনায় বিরাজমান। তাই নীট্শে অস্তিত্ববাদের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত একজন চিন্তাবিদ, এতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তিনি নান্দনিকতাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। জীবনকে তিনি শৈল্পিকভাবে যাপনের কথা বলেছেন। আবেগ অনুভূতিকে নান্দনিকবোধ দ্বারা তুলে এনে তার ওপর ভিত্তি করে তিনি মানুষকে তীব্রভাবে আত্ম-উন্নতি তথা আত্ম-অতিক্রমের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। যুক্তি-বুদ্ধি প্রজ্ঞা ইত্যাদির বদলে মানুষের সহজাত বৃত্তির মধ্যকার আবেগ অনুভূতি তথা অযৌক্তিক নান্দনিক বোধকে তিনি আত্ম-উন্নতির ক্ষেত্রে তথা অস্তিত্বশীল হবার জন্য যেভাবে ব্যবহার করেছেন অন্য কোন পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদীদের সাথে তার তুলনা করা চলে না। তাই তাকে অন্য সকলের চাইতে একটু ভিন্ন রকম অস্তিত্ববাদী বলাই শ্রেয় বলে মনে করি। আর এই বিশেষ নামকরণ করতে হলে তাকে নান্দনিক অস্বিত্ববাদী বলাটাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে মনে করা চলে।

আধুনিকতার মাত্রারিক্ত যুক্তিবাদিতার বিরুদ্ধে উত্তরাধুনিকতার নানামুখি চ্যালেঞ্জ দর্শনের চিরাচরিত ধারাকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করেছে। প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্যদর্শনের যাত্রা শুরু হয়েছিল মীথ আশ্রিত ভাবনার প্রতি বিরাগ হয়ে। প্রাচীন গ্রিসের সাহিত্যিকগণ অতিমাত্রায় কল্পনা ও আবেগ আশ্রিত হয়ে জগৎ জীবন সম্পর্কিত এমন সব কল্পকাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন যা বুদ্ধিবৃত্তির ধারক যৌক্তিক মনের নিকট অনেক ক্ষেত্রেই স্ববিরোধী এবং অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলো। প্রাচীন গ্রিসে হোমার হোমিয়ড, সফোক্লিস, স্কাইলাস প্রমূখ কল্পকাহিনীয়কারদের নানা মত তৎকালীন কিছু যুক্তিবাদী চিন্তকের মনে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। এর বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত জগৎ ও জীবন ভাবনাকে তুলে ধরার প্রয়াসেই শুরু হয়েছিলো দর্শনের যাত্রা। তাই বলা চলে সূচনাপটে, বিশেষকরে, পাশ্চাত্য দর্শনের সূচনা অনেকটা শিল্প-সাহিত্য বা শিল্পকে চ্যালেঞ্জ করেই গড়ে উঠেছিলো। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা চলে আবেগ-কল্পনা-অনুভূতির বিপক্ষে যুক্তির জয়গান করেই দর্শনের যাত্রা সূচিত হয়। দর্শন মাত্রেই যেন যুক্তিজাত তাত্ত্বিক প্রয়াস। যুক্তির মাধ্যমেই জ্ঞান তথা সত্যের আরাধনা করাই দার্শনিকদের মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

মধ্যযুগে ধর্মীয় সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ দর্শনের যুক্তিবাদী স্বাধীন চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে সামগ্রিকভাবে। যুক্তি এখানে অথরিটির তাবেদার হয়ে ধর্মীয় নির্দেশনাকে তথাকথিত দার্শনিকতার পোষাক পড়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দার্শনিক হয়ে ওঠেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ধর্মীয় ব্যাখ্যাকার ও প্রচারক। পাচ্যে এই ধারার ব্যতিক্রম থাকলেও পাশ্চাত্যে গোটা মধ্যযুগের মূল ধারা এভাবেই তার ঐতিহ্য হারিয়ে প্রকৃত দার্শনিকতার পথ ছেড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। বিজ্ঞানের অবস্থা তদ্রূপ হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা এ যুগকে তাই অন্ধকারের যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। কেননা যুক্তির আলো সেখানে নির্বাপিত। মানুষকে বাধ্য করা হয় অন্ধবিশ্বাস আশ্রিত হয়ে এক যুক্তিহীন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হতে।

তবে মানুষের যুক্তিবাদী ও শৈল্পিক চেতনা অদম্য। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষ আবারও যুক্তির আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়। দেখা দেয় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। অন্ধবিশ্বাসী মোহ নিদ্রা কাটিয়ে মানুষ জেগে উঠতে থাকে। অতীতের ঐতিহ্যকে ফিরে পাবার এক অদম্য নষ্টালজিকতায় পেয়ে বসে মানুষকে। মানুষ গলা ছেড়ে গেয়ে চলে মুক্তির গান। যুক্তি প্রমাণের প্রবল জোয়ারে ভেসে যায় আবেগ, অনুভূতি, কল্পনার সব ধরনের সৃজনশীল প্রয়াস। সবকিছুকেই যেন যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণসিদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। এমনকি কোন শিল্পীকেও হয়ে উঠতে হবে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক। এ ধরনের দাবী ধম্যযুগে প্রবর্তিত ধারারই যেন পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মধ্যযুগে চাপিয়ে চেষ্টা হয়েছিলো বিশ্বাস আর এই আধুনিক যুগে চাপিয়ে না দিলেও যুক্তি প্রমাণ যেন ছাপিয়ে ওঠে সকল মানব চেতনাকে। প্রবল দাপটে যুক্তি-প্রমাণ শাসন করে চলে আধুনিক মনন। যুক্তিতেই মুক্তি। প্রমাণেই শক্তি। কল্পনা যেন কলঙ্কজনক, আবেগ যেন অন্ধ, অনুভূতি যেন অপরাধী। যুক্তি যেন আলোকবর্তিকা, ব্যবহারিক প্রমাণ সেই আলোককে যেন কাছে টানে। এভাবে মধ্যযুগীয় তথাকথিত অন্ধকারের যুগের বিপরীতে আধুনিক যুগকে আলোকের যুগ বা জ্যোর্তিময়তার যুগ বলে তুলে ধরা হয়। যুক্তিনির্ভর দর্শন আর (পরীক্ষণাত্মক) প্রমাণনির্ভর বিজ্ঞান একে অন্যে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়। দর্শন বিজ্ঞানের নিকট থেকে প্রামাণিত সত্য ক্রয় করে, অন্যদিকে জ্ঞান দর্শনের যুক্তিবাদী চেতনাকে ধার করে প্রকৃতিকে সন্দেহমুক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে সজাগ করে ওঠে। দর্শন বিজ্ঞানকে শক্তি জোগায় পদ্ধতিতত্ত্ব দিয়ে, কোন বিশ্বাস নির্ভরতা কাটাতে। অন্যদিকে বিজ্ঞান দর্শনের চিরাচরিত অনেক সমস্যার হাতে কলমে সমাধান করে তাকে ঐ ভিত্তির ওপর আরও নতুন করে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু সমস্যা হয় তখন যখন দর্শন বিজ্ঞানের মতো হতে চায়।

আধুনিক অনেক দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণকে বৈজ্ঞানিক (পরীক্ষণাত্মক) প্রমাণের মতো করে সুনিশ্চিত সত্য হিসেবে দার করাতে চেষ্টা করেন। অতিমাত্রায় যুক্তিবাদ, এমনকি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ভর হবার প্রতি আকুতি আধুনিক জীবনকে অনেকটা যান্ত্রিক করে তোলে। আবেগ অনুভূতি কল্পনার অবমূল্যায়নের এই ক্ষেত্রের বিপক্ষে সম্প্রতিককালের কিছু দার্শনিক অবস্থান নেয়। তারা যুক্তিকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেন। যুক্তির ক্ষমতা এবং মানবজীবনে তার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তারা গবেষণা করেন। এবং তার সাথে সাথে অযৌক্তিক দিক যেমন বিশ্বাস, অনুভূতি, আবেগ, কল্পনা ইত্যাদিকে তারা প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। আধুনিক যুগ তথা যুক্তির আলোয় জ্যোতিময় ধারার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এভাবেই সৃষ্টি হয় অযুক্তিবাদী অন্য একটি দার্শনিক ধারা। সোরেন কিয়ার্কেগার্দ, আর্থার শোপেনহাওয়ার হয়ে ফ্রেডরিক নীট্শের মাধ্যমে এই অযুক্তিবাদী ধারার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। নীট্শের দার্শনিক অবস্থানের প্রাধান দিক অস্তিত্ববাদ। এক্ষেত্রেও তিনি অযৌক্তিক নান্দনিক পবাধকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. Nigel Warburton, *A Little History of Philosophy*, Yale University Press, New Haven and London, 2oll, P. 172

২. Nietzsche, *Twilight of the Idols,* Translated by Walter Kaufman and R. J. Hollingdale, See: www.file:///c:/Document and Settings/A1/Desktop/*Nietzsche, Twilight of the Idols,* Accessed on: 18.01.2018, [Ch. Two: "The Problem of Socrates]"

৩. *Ibid,* Ch. Three: "Reason in Philosophy"

৪. Jorge E. Bonilla, *The Role of Art in Nietzsche's Philosophy,* Sec: www.file:///c:/ Documents and Setings/A1/Desktop/ Art in Nietzsche's Philosophy, Accessed on: 16.01.2018.

৫. *Loc. cit.,*

৬. *Loc. cit.*

৭. *Loc. cit.*

৮. *Ibid.*

৯. *Loc. cit.*

১০. Friedrich Nietzsche, *The Birth of Tragedy and The Case of Wagner,* Translated by Walter Kaufmann, Vintage Book, New York, 1967, p. 33

১১. Nietzsche, *Twilight of the Idols, Op. cit.* [The Problem of Socrates]

১২. *Loc. cit.*

১৩. *Loc. cit.*

১৪. See. Lee Spinks, *Friedrich Nietzsche,* Rutledge, London, 1993, pp, 74-75.

১৫. *Ibid.* 109
১৬. *Ibid.* p. 110.
১৭. Nietzsche, *The Gay Science*, Edited by Bernad Williams, Translated by Josefine Nauckhoff, Cambridge University Press, UK, 2007, p. 53
১৮. *লা রোশফুকোর মাক্সিম*, অনুবাদ: চিন্ময় গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৩০
১৯. Nietzsche, *The Gay Science, op. cit.* p. 29
২০. Kubla Khan, Samuel Taylor Coleridge, 1772 - 1834
২১. *Loc. cit.*

Abstract: Friedrich Nietzsche (1844-1900) is a remarkable thinker in contemporary western philosophy. It is very difficult to designate his philosophical works with a precise name which is found in the history of philosophy. As a prolific writer and polymath, he desired to reshape many areas of knowledge he touched. Although it is a fact that there is no dearth of interpretation on Nietzsche's philosophy, it seems to me that an appropriate perspective for unavailing the actual motive of his words is very lacking. Though he is known as one of the most influential of all existentialists, he maintains a very distinct position which can be misunderstood for many reasons. So his philosophy gets immense possibilities to be interpreted in many different ways.

In this article, I would like to entitle his existential philosophy as *Aesthetic Existentialism* which is based on his view concerning art and beauty. For my part, it is very unfortunate to treat him a misanthropic nihilist, but rather his aesthetic existentialism offers a very positive program to reaffirm life. Nietzsche is not merely a philosopher, he is an artist also. So he ought to be understood as an aesthetician. He inspires us to act like an artist having a feeling of intoxication with the beauty of life. His aesthetic view gives very optimistic notions to life, and I like to say that it the core thing in his existential philosophy.]